পুজো সংখ্যার সেকাল-একাল

সন্দীপ কুমার দাঁ

ভাদ্রমাসের শুরুতে আকাশ যখন সবে নীল হতে শুরু করেছে, রোদ্দুরে সোনালি আভা ধরেছে, পথ চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তায় বুক স্টল-এ চোখ আটকে মন উন্মনা হয়ে যায় স্থূলকায় বইগুলোর দিকে তাকিয়ে—শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বাঙালি দুর্গোৎসবের অন্যতম আগমনী—শারদীয়া সংখ্যার আত্মপ্রকাশ। শারদীয়া সংখ্যা এখন বাঙালির পুজো কালচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমানে প্রায় ১০০টির মতো পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন আগে 'পূজা সংখ্যা' নামের একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—"সাম্প্রতিককালে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের মাসিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলির সম্পাদকমণ্ডলী যে পূজাসংখ্যারূপে এক নূতন সংক্রামক প্রথার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনন-জীবনে যে প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে, তাহা মোটেই বহিরঙ্গ বলিয়া উপেক্ষিত নহে।"

পুজো উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সংস্কার সভা' তাদের তৎকালীন বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সুলভ সমাচার'-এর একটি সংস্করণ 'ছুটির সুলভ' নামে প্রকাশ করেছিল ১২৮০ বঙ্গাব্দের পুজোর সময়। অবশ্য পুজো সংখ্যা বলে এতে কোনও উল্লেখ ছিল না, কারণ সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্ম—স্বভাবতই পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস ছিলেন না তিনি। 'ছুটির সুলভ' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার। দাম ধার্য হয়েছিল এক পয়সা। ওই বছর ১ আশ্বিন এই বিশেষ সংখ্যাটির একটি চমৎকার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সেটি ছিল এইরকম—

ছুটির সুলভ!!
আগামী ছুটি উপলক্ষে সুলভের বিশেষ একখণ্ড বাহির হইবে।
উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা। দাম কিন্তু ১ পয়সা।
মজা করে পড়িতে পড়িতে ঘরে যাও। একটা পয়সা দিয়ে সকলের কিনিতেই হইবে। দেখ যেন কেউ ফাঁকি পোড়ো না।[১]

'সুলভ সমাচার' পত্রিকার এই বিজ্ঞাপনটিই পুজো সংখ্যার প্রথম বিজ্ঞাপন। প্রথম বিজ্ঞাপনের এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৮ আশ্বিন, মঙ্গলবার 'ছুটির সুলভ'-এর আরও একটি

---

১. বাড়িতে যেমন ভিয়েন বসে আমাদের ছুটির সুলভেরও ভিয়েন বসিয়াছে। এবার ভালো-মন্দ, নীতি, তামাসা, নানারকম ছবি, কিছু কিছু ধর্মের কথাও বাহির হইবে। ছেলে, বুড়ো, যুবা সকলে যেন এক-একটি পয়সা দক্ষিণা দিয়া ইহার পূজা করেন।

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনের ভাষাটি ছিল বেশ মজার—

"আগামী বৃহস্পতিবার 'ছুটির সুলভ' বাহির হইবে। কেমন সুন্দর কাগজ, কেমন পরিষ্কার ছাপা, কেমন মজার ছবি, অথচ কেমন সস্তা দাম। ছেলে বুড়ো সকলেই মজা করিয়া 'ছুটির সুলভ' পড়ো। দেখ যেন কেউ ফাঁকি পড়ো না।...কত মজার মজার কথা।"

অনেকরকম মনোগ্রাহী রচনা আর ছবিতে সাজানো ছিল এই প্রথম পুজো সংখ্যাটি। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যাটি পাঠক সমাজে বিপুল সাড়া জাগায়। সারা বছর পরিশ্রমের পর পুজোর ছুটি আসে। সেই পুজোর ছুটি আনন্দে ভরিয়ে দেবার জন্য হাসি আর মজার মোড়কে এই সংখ্যার লেখাগুলি পরিবেশিত হয়েছিল। সেখানে ছিল একটু সাহিত্য, একটু সচেতনতা, আর ছিল এক সত্য গল্প। প্রথমে সেই 'সত্য গল্প'টির কথা বলি। কোনও এক গ্রামের মাতাল জমিদার ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে কী কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, তারই কাহিনি। বর, কনে এবং কনের এক মামা ছাড়া বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের সবাই মাতাল, তাদের নিয়ে গল্প। গল্পের কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"...বরের বাড়ি হইতে কন্যার বাড়ি প্রায় ৬/৭ ক্রোশ অন্তর হইবে। সুতরাং বরের পিতা বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে অনেক বরযাত্রী সঙ্গে করিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত বিবাহ দিতে বাহির হইলেন। অধিক বেলা হওয়াতে অর্ধেক পথ গিয়া সকলেই বিশ্রামার্থ বসিল এবং আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। এদিকে সকল লোকগুলিই মদের পিপে, বরকর্তা ততোধিক। মায় নাপিত পুরোহিত বেহারা বাজনদেরে দরয়ান। ঢুলির ঢোল গড়াগড়ি যাইতেছে, বেহারাগুলো ভোঁ হয়ে পড়ে আছে, বরযাত্রীগুলো যত পেরেছে ততো খেয়েছে, সব নিস্তব্ধ বর কেবল একা পাল্কিতে বলে হপু শুনিতেছেন, ওদিকে কন্যাকর্তার বাড়ি আচ্ছারকম সাজানো হইয়াছে। কন্যাকর্তাটি আবার এখনকার ইয়ং বেঙ্গল দলের লোক, সুতরাং তাঁহার আবার দিশীতে সানায় না, বিলিতী না হইলে তাঁর রঙ্গ হয় না। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব প্রতিবেশি মেয়েছেলে যে যেখানে ছিল সকলেই একেবারে অচেতন, কে কোতায় যে আছে তাহার নির্ণয় নাই। কেবল কন্যার মামা নিরামিষাশী, সুতরাং যত রাত্রি হইতে লাগিল ততই তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। মহা বিপদে পড়িয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন, জাতি কুল যায় কি করেন তখন নিজে হেঁটে এসে পাত্রকে লইয়া গিয়া ভোরে বিবাহ দিয়া কোনরকমে শুদ্ধ হইলেন। পর দিবস বরকর্তা বরযাত্রীদের নেশা ছুটিল, সকলের তখন হুঁশ হইল। বরকর্তা বড়ই ব্যস্ত, মনে কতই ভাবনা, নটার সময় লগ্ন স্থির হইয়াছে ইহার মধ্যে যাইতেই হইবে। সুতরাং শীঘ্র আহারাদি সারিয়া কন্যার বাড়ির দিকে চলিল। এদিকে বর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বর কৈ কৈ বলিয়া এক মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।..." গল্পের শেষে দেখা যায়, বরকর্তা মদ্যপ অবস্থায় তাঁর পুত্রবধূকে দেখতে চান। কিন্তু পুত্র তাতে রাজি হয় না, কারণ সে তার 'বাপের চরিত্র জানে।' সেই রাগে মদ্যপ বাবা পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করে দেন। এখানেই গল্প শেষ। গল্পটির লেখককে জানা যায় না কারণ, তখন লেখক বা সম্পাদকের নাম ছাপা হত না।

এই সংখ্যাটির আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য লেখার কথা বলি। 'রেলওয়ে কোম্পানির নূতন আইন নামে একটি রচনায় রেলের সমালোচনা করে লেখা হয়েছিল—"রেলওয়ে কোম্পানী দীন দুঃখী তৃতীয় শ্রেণীর ও ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের আরোহীদের প্রতি এত নির্দয় হইলেন কেন? তাঁহারা প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে অনায়াসে বিনা মাসুলে বাড়ির সমস্ত আসবাব লইয়া গাড়িতে উঠিতে দেন, কিন্তু যে গরীবদের টাকায় তাঁহাদের অন্ন চলিতেছে তাহারা একটা সামান্য কাপড়ের বোঁচকার জন্য যদি ছাড়ান না পায়, তবে কি নিতান্ত ন্যায় ও দয়া বিরুদ্ধ কাজ হয় না?..." প্রসঙ্গত বলে রাখি, ওই রচনায় এটি জানানো হয়েছিল যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা এক হাত লম্বা এবং পাঁচ সের ওজনের বেশি কোনও বোঁচকা নিয়ে রেলে উঠতে পারবেন না—এই ছিল রেল কোম্পানীর ফরমান।

এখানকার পত্রিকায় যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক নিবন্ধ বা ফ্যাশন সংক্রান্ত রচনা থাকে সেরকমও দুটি লেখা ছিল। প্রথমটির নাম 'পাখির শহর'। এই লেখাটিতে আমেরিকার 'গরফু' নামের একটি পাখির জীবনযাত্রার প্রকৃতি, তাঁর চেহারা, চরিত্র সরস ভঙ্গিমায় লেখা হয়েছে। আর 'কাঁচের চুল' রচনাটিকে অনায়াসেই ফ্যাশন সংক্রান্ত রচনা বলা যায়। এই প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, যদিও কাঁচ ভঙ্গুর, ইংরেজরা কিন্তু তাদের নিপুণহাতে কাঁচের চুল তৈরি করে। এ চুল আসল চুলের মতোই নরম এবং বিনুনি করলেও তা ভাঙবে না। লেখাটির শেষে সরস মন্তব্য—"কাল কাঁচের সহজেই চুল হইতে পারে মেয়েরা পূজার সময় সে রকম চুল পাইলে অনায়াসে কোনরকমে তাহা মাথায় বসাইয়া সুন্দরী হইতে পারেন।"

এতক্ষণ যে লেখাগুলির কথা বললাম, সেগুলি সবই সরস ভঙ্গিমায় লেখা।

আরও বেশি মজার আরও কয়েকটি লেখা ছিল সেখানে। সেগুলির প্রসঙ্গে আসি। একটি লেখার নাম 'মুষ্টিযোগ', সেখানে শুক্তির মতো চুটকির ছড়াছড়ি। তার কয়েকটা উদাহরণ দিই।

"অগ্নি দ্বারা হস্ত কি শরীরের কোনও অংশ পুড়িয়া গেলে কি করিতে হয়?

দগ্ধ স্থানে অডিকোলন ঢালিয়া দিতে হয়।

কোন্ সময়ে লোকের সঙ্গে কথা কহা উচিত নহে?

যখন তাহার রাগ হইয়াছে।

কোন সময়ে লোকের সঙ্গে কথা কহা উচিত?

যখন দুঃখ হইয়াছে।

দিবসে নিদ্রা গেলে কি হয়?

পেটের পীড়া হয়, জ্বর জ্বর ভাব হয়, সহজে ক্রোধ হয়, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, মুখশ্রী জঘন্য হয় এবং আপনাকে আপনি গালাগালি দিতে ইচ্ছে করে।

চোখে পোকা পড়লে কী হয়?

চোখ না রগড়ে যেদিক থেকে পোকা এসেছে, সেই দিকে দৌড়ে যেতে হবে।

ডাইনে খাইলে রোজা এসে জলপড়া দিয়ে মুখে ছিটে মারে কেন?

অজ্ঞান কিংবা বিহ্বল ব্যক্তির মুখে শীতল জলের ছিটে সজোরে মারিতে পারিলেই জ্ঞান হয়।

কুকুরের সম্মুখে দৌড়িলে সে তাড়া করে, মাতালের সম্মুখে ভয় প্রকাশ করিলে সে চাপিয়ে ধরে—

কুকুর এবং মাতাল উভয়কে অগ্রাহ্য করাই তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়।

ছিল 'ছবি' নামে কার্টুনের মতো মজার মজার ছবি। ছবি সাজিয়ে লেখা হয়েছিল, "ওরে বাবা! আমি মদকে খাই না, মদ আমাকে খায়। ওই কামড়াতে আসচে! পালা পালা!" এরপর মদ্যপানের বিষময় পরিণতি সম্বন্ধে রসিকতা সহকারে পাঠকদের সাবধান করা হয়েছে, নাহলে যে 'মদে এবং ব্যভিচারে দেশ রসাতলে যাইবে।' শেষে কাব্য করে বলা হয়েছে—

'ওরে সুরা তোর অত্যাচারে,
বসে বঙ্গমাতা কাঁদে আনবার নীরবে নির্জনে,
ব্যাকুলিত মনে,
সে দুঃখ হেরিলে বিদরে হৃদয়।'

একেবারে শেষে ছাপা হয়েছিল মজার কুইজের মতো 'মজার কথা'। যেমন—'এমন নিরাকার জিনিষ কি আছে যাহাতে আকার দিলে মানুষের টাকা হয়? উত্তর—টাক।...পূর্বকালে মনুষ্য মন কি ছিল? ডারউইন সাহেব বলেন মন কি (বানর ছিল)।...শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়প্রকার সন্ধি আছে? ছাত্র উত্তর করিল, তিনপ্রকার, স্বরসন্ধি, হল সন্ধি ও কাসন্দি।...আজকাল নাটক লিখিবার খুব ধূম পড়িয়াছে। একজন অনেক যত্ন করিয়া রামচেঁদে গোচের নাটক লিখিয়া কোন বন্ধুর নিকট মত জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু আগাগোড়া পড়িয়া বলিলেন, "রাম! না টক না মিটে।"...সাহেবদের মধ্যে অনেক বড়ো লোকের নাম শৃগাল, শুকর ইত্যাদি। আমরা যদি এই সভ্যতার সময়ে সাহেবদের আর সব অনুকরণ করি, তবে আমরা কেন শৃগাল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শুকর চন্দ্র বসু নাম না ধারণ করি?"

এমন একটা মজার সংখ্যার জন্যই তো সম্পাদক মশাই লিখতে পেরেছিলেন, 'এই পত্রিকা যদি কেহ না ক্রয় কর বলিব—উঃ কি কৃপণ একটা পয়সায় মা বাপ!" তবে এই পত্রিকাটিতে ছোটোদের জন্য আলাদা করে কিছু ছিল না। শুধু বাসন্তী রঙের মলাটে এক ছবি ছিল—একটি ছেলে সাবানের ফেনার বুদবুদ ওড়াচ্ছে। এই ছবিটি ছোটোদের খুব পছন্দ হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "...ছোটোদের জন্য তখন বাসন্তী কাগজের দুইখানি মাত্র পাতায় পূজার সুলভ আদুরে ছেলে গাল ফুলাইয়া ক্রমাগত সাবানের বুদবুদ উড়াইতেছে, এই চিত্রটির ছাপ লইয়া বাহির হইত, আর সবই ছিল বড়দের জন্য।"

একটা কথা এখানে বলা যায়, পুজো সংখ্যা হিসাবে বেরোলেও এই সংখ্যাটিতে পুজো সাহিত্য তেমনভাবে ছিল না বরং ওই বছরই কার্তিক মাসে মনোমোহন বসু সম্পাদিত

'মধ্যস্থ' পত্রিকার ২ কার্তিক সংখ্যায় দুর্গোৎসব নিয়ে বিবরণ, 'দুর্গাবন্দনা' নামে কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, আর ৯ কার্তিক সংখ্যাটিতে ছিল 'দুর্গোৎসব' নামে এক দীর্ঘ কবিতা আর উৎসবের মনোরম বর্ণনা। কোনও কোনও কাগজে পুজো উপলক্ষে বিশেষ রচনা প্রকাশিত হত। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ দেখা যেত পুজোর পদ্য।

পুজো সংখ্যা না হলেও পুজোর সময় বটতলা থেকে প্রকাশিত হত ছোটো ছোটো মজাদার বই। বেশিরভাগ বইয়ের দাম ছিল এক পয়সা, লেখা থাকত—'দুর্গাপূজার রংতামাসা, পড় দিয়ে একটি পয়সা।' পুস্তিকাগুলির মলাটেও এই রংতামাসার কিছু আভাস থাকত। একটির মলাটে লেখা ছিল—

'এবার পূজায় গিরিবালা
চেয়েছেন সোনার মোহনবালা
দুর্গা পূজায় ভারি ধুম
ভেবে লোকের নাইকো ঘুম।'

১৩০২ সালে আপার চিৎপুর রোড থেকে এন কে শীল প্রকাশিত একটি বইতে মলাটে ছিল দুর্গাঠাকুরের ছবি আর লেখা ছিল—

'এবার পূজায় বিষম দায়
বউ পাঁচশো টাকা চায়
ঢাকাই শাড়ি সোনার গয়না
সেসবে আর মন বোঝে না
ঘর বাড়ি বিকিয়ে যায়
তবু বউ পালিয়ে যায়
বাবু হাবুডুবু খায়...ইত্যাদি

আর সেগুলির ভেতরে কেমন লেখা থাকত, তার একটু নমুনা দিই—

"গিন্নীর আবদার—এ পুজো ফরমাস মতো চাই গয়না
আমি তোমার তক্ক নক্ক কিছুই শুনবো না
দাও যদি প্রাণ এসব জিনিষ
দিব্যি করে কচ্ছি প্রমিশ
তাহলে সুখে আমি করবো ঘরকন্না
আমার মনের মতো গহনা না দিলে
মরবো আমি ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ জাহ্নবীর জলে।"[২]

২. আরেকটি একটি পুস্তিকায় ছিল—

'কার্তিক ভায়া সাহেব সেজেছে।
দেখে ভোলা খেপে দাঁড়িয়েছে।
কলাবৌয়ের লাগল তাক।
গণেশ বলে যাব না বাপ।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের শ্রীষড়ানন শর্মা ছদ্মনামে লেখা 'দুর্গোৎসব উদ্ভট কাব্য' একবছর পুজোয় প্রকাশিত হয় এবং খুবই জনপ্রিয় হয়। সাধারণ নিম্নবিত্ত সংসারে পুজো যে বাড়তি দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে, সেই কাহিনিচিত্র—

"কত পরিবার মাঝে হয় হাহাকার
পূজার কাপড় বুঝি হল না এবার;
কর্তার কলহ হয় কলত্রের সাতে
কেমনে কাপড় হবে কিছু নাই হাতে।
কতদিন হাতে কর্ম কিছু নাই তাঁর
ভেবে ভেবে ক্ষুণ্ণ মন অখিল আঁধার।
জীবিকা নির্বাহ তরে ভেবে নিরুপায়
গৃহিনী আসিরে কত বকিছেন তায়।
ছি ছি ছি অভাগী আমি না হয় মরণ
নির্গুনের হাতে পড়ে হই জ্বালাতন।
কে শুনে দুঃখের কথা কহিব বা কারে
কিছুরই নাহিক স্থিতি এ পোড়া সংসারে।"[৩]

বিগত বঙ্গাব্দের বিশ-এর দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশ শুরু, আর এই দশকের শেষ থেকে শারদীয়া সংখ্যাগুলির জনপ্রিয়তা আর বিকাশ বৃদ্ধি হতে থাকে। ১৩২০ বঙ্গাব্দে মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা তাদের কার্তিক সংখ্যাটি বৃহৎ আকারে অনেক খ্যাতিমান লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ করে শারদীয়া সংখ্যারূপে প্রকাশ করে। ওই সংখ্যাটিতে লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, নিরুপমা দেবী, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত লেখকগণ। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে মাসিক 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি। ১৩৩২ সনে মাসিক বসুমতী পত্রিকার আলাদা শারদীয়া সংখ্যা পাঠক সমাজে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। এই পুজো সংখ্যাটি এক অর্থে ইতিহাস সৃষ্টিকারী। কারণ, এই পুজো সংখ্যাতেই প্রথম উপন্যাস ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ১৩৩২ থেকে পরপর তিন বছর এদের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি বছর থাকত তিনটি করে উপন্যাস লেখক তালিকায় ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অনুপমা দেবী, দেবেন্দ্রকুমার বসু, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ। ১৩৩৪ সনের এই পুজো সংখ্যাটির বাড়তি আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পরিত্রাণ'। আর ছিল পুজো সম্পর্কিত নটি কার্টুন এবং চারুচন্দ্র সেনগুপ্তের আঁকা মা দুর্গার রঙিন ছবি।

---

৩. এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছিল হারাধন চক্রবর্তীর 'আগমনী পুস্তিকা', অখিলচন্দ্র লাহিড়ীর 'পূজার পাগল', অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর 'পুজোর গল্প' ইত্যাদি কাব্যপুস্তিকা। এছাড়াও বেরিয়েছিল জালালউদ্দিন আহম্মদ নামে এক মুসলমান কবির কাব্যপুস্তিকা, নাম—'পূজার বাজার'।

১৩৩৩ সনে ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা 'ভারতী'-র পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় তাদের পূজা নাম্বার, যার দাম ছিল এক টাকা। এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল শরৎচন্দ্র রচিত 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী', যে নাট্যরূপ রচনা করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ভারতী' নামের একটি কবিতা। স্বরলিপি সহ দুর্গা-চণ্ডী ও শিবগীতি রচনা করেছিলেন সরলা দেবী। এছাড়াও ছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছবি এবং লাল কালিতে ছাপা প্রাচীন দুর্গার ছবি।

'ভারতী' এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত লিখেছেন, আবার শরৎচন্দ্র বেশি লিখেছেন 'যমুনা' এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'যমুনা' পত্রিকার প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ওই বছরের ভাদ্র সংখ্যায় 'যমুনা'-র এই পুজো সংখ্যা সম্বন্ধে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শিরোনামে লেখা হল—'বঙ্গের যাবতীয় প্রথিতনামা লেখক ও লেখিকাগণের প্রবন্ধ গৌরব যমুনার জন্য আমরা কিরূপ সুন্দর ও সর্বজন প্রীতিকর প্রবন্ধরাজির আয়োজন করিয়াছি। কিরূপে এবার হইতে বিবিধ বিষয়ের সুপাঠ্য প্রবন্ধরাজি যমুনার অঙ্গশোভা বর্ধন করিতেছে, আশ্বিন সংখ্যা প্রাপ্তমাত্রেই তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।' এই শারদীয়া সংখ্যাটি সত্যই আকষর্ণীয় হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথ পাল এবং জাহ্নবী পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের যৌথ সম্পাদনায় এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে। এই সংখ্যাটির নামকরণ হয় 'সচিত্র শারদীয় সংখ্যা নারায়ণ'। এই সংখ্যায় ছিল তিনটি পূজাকেন্দ্রিক প্রবন্ধ—বিপিনচন্দ্র পালের 'বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব' এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা'। আর ছিল ললিতচন্দ্র মিত্রের 'আগমনী' ও 'বিজয়া' নামে দুটি কবিতা। এছাড়াও ছিল তিনটি ছবি, একটি ভবানীচরণ লাহা অঙ্কিত রঙিন ছবি 'গণেশ জননী'; অপর দুটি ছবি ছিল 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ও 'অষ্টদশভুজা' নামে।

দৈনিক বসুমতীর পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হত বার্ষিক সংখ্যা হিসাবে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বার্ষিক বসুমতীতে ছাপা হয়েছিল উনিশটি রঙিন ছবি। ১৩৩৩-এ ছিল পনেরোজন শিল্পীর ছবি, এর মধ্যে অনেক শিল্পীর একাধিক ছবি ছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা চারটি ছবি ছিল আর ছিল তাঁর লেখা 'দাদাভায়ের দেয়ালা' যেটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় 'ভোঁদড় বাহাদুর' নামে। বার্ষিক বসুমতীতে বিভিন্ন বছরে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কালিদাস রায়, জলধর সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা।

আনন্দবাজার পত্রিকা দু-পাতার প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে কাগজের সঙ্গে ১৩২৯ সনে। এই সংখ্যাটিতে ছিল দুর্গোৎসবের ওপর সম্পাদকীয়, পুজোর বাজার নামে

ব্যঙ্গচিত্র। পুজোসংখ্যা হিসাবে এর বিশেষত্ব বোঝানোর জন্য পৃষ্ঠাগুলি লালকালিতে ছাপা হয়েছিল। ১৩৩৩ সনে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম পৃথক ৫৪ পৃষ্ঠার শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত করে, দাম ছিল দু-আনা। ছবিহীন মলাট, লালকালিতে ছাপা। তবে এই সংখ্যায় কোনও উপন্যাস ছিল না। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃথক পুজোসংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে। দাম ছিল আট আনা। ছাপা হয়েছিল ত্রিশ হাজার কপি। সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত লেখক ও মনীষীরা, যেমন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার যদুনাথ সরকার, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নরেন্দ্র দেব, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অতুল সুর প্রমুখ। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন সাহেবদের পোশাক নিয়ে, লীলাময় রায় ছদ্মনামে। নরেন্দ্র দেবের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল বাংলা সিনেমার সূচনাপর্ব। সুরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন লাইনোটাইপ ছাপার পদ্ধতি নিয়ে। এই সংখ্যায় কবিতাও ছিল অনেকগুলি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ছিল সজনীকান্ত দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখের কবিতা। ছিল বেশ কয়েকটি ছবি, যার একটি ছিল নন্দলাল বসুর আঁকা। তখন রঙিন ছবির ছাপার পদ্ধতিতে অনেক জটিলতা থাকলেও, ছাপা ছবিগুলি খুবই নয়ন মনোহর হয়েছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম উপন্যাস ছাপা হয় ১৩৪৬ সনে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী'। এই সংখ্যাতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের বেশ কয়েকটি গল্পও ছাপা হয়েছিল। ওই সংখ্যাতেই ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো গল্প 'রবিবার'। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন, তখন তাঁর চরম আর্থিক সংকট। সে অবস্থার কথা অনুজ কবি বুদ্ধদেব বসুকে চিঠি লিখে জানিয়েওছিলেন—"অর্থের প্রয়োজনে গল্প লিখতে হয়েছে, অর্থ উপার্জনের অন্য কোনও সহজ পথ জানিনে—বিপদে পড়লে সরস্বতীকে পাও্তা করে লক্ষ্মীর দরজায় যেতে হয়। সে লেখাটা বিক্রি করেছি। ভবিষ্যতে আবার গল্প লিখতে হবে কিন্তু একই কারণে। ব্যবসাটা অর্থকরী নয় কিন্তু ভিক্ষার চেয়ে অন্তত ভদ্র।" আনন্দবাজারের এই পুজোসংখ্যাটির দাম ছিল এক টাকা, প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যতীন সেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয় দুটি উপন্যাস—সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'শতাব্দীর অভিশাপ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি'। যদিও পরবর্তীকালে ল্যাবরেটরিকে আর উপন্যাস বলে ধরা হত না, তখন কিন্তু ওটি উপন্যাস হিসাবেই ছাপা হয়েছিল। ল্যাবরেটরি গল্পটি রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, তখন তিনি খুবই অসুস্থ। সেইসময়কার কথা ধরে রেখেছেন তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী তাঁর 'নির্মাণ' বইটিতে। অসুস্থতার কষ্টকে উপেক্ষা করে লেখা ওই গল্পটি যখন পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তখন কবি কতটা আনন্দিত হয়েছিলেন, তা জানা যাচ্ছে প্রতিমা দেবীর লেখা থেকে—"জোড়াসাঁকোয় বাবামশায় দু'মাস রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, কী কষ্ট পেয়েছেন চোখে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন তাঁর এই অসুস্থতার মধ্যে পুজোর 'আনন্দবাজার' বেরোল, তাতে 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, অসুখের মধ্যেও সেদিন তিনি ভালো ছিলেন,

তাই কাগজখানি আসবামাত্র আমার স্বামী তা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন। ...বন্ধু-বান্ধব এসে গল্পটির প্রশংসা করলে অসুখের মধ্যেও তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।'

একবার পুজোসংখ্যায় লেখার জন্য আগাম অর্থ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন বন্যাপীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্যে। এ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লেখেন—"এখানকার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ চেষ্টায় ছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমারও দুঃসময়। কিছু দিতে পারছিলুম না বলে মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এমন সময় দেশ ও আনন্দবাজারের দুই সম্পাদক পূজার সংখ্যার দুটি কবিতার জন্য একশো টাকা বায়না দিয়ে যান, সেই টাকাটা বন্যার তহবিলে গিয়েছে। আগেকার মতো অনায়াসে লেখবার ক্ষমতা এখন নেই। সেইজন্য 'বিস্ময়' কবিতাটা দিয়ে ওদের ঋণশোধ করব বলে স্থির করেছি। ক্লান্ত-কলম নতুন লেখায় প্রবৃত্ত হতে অসম্মত। কার্তিক সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে একটি কবিতা দিয়ে অন্যটি হস্তান্তর করা ছাড়া আমার উপায় নেই। কিছুদিন থেকে শরীর বিশেষভাবেই অসুস্থ হয়েছে, সাধারণ ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি।"

পরবর্তীকালে ১৩৪৮ সনের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'প্রগতি সংহার' গল্পটি, তখন অবশ্য কবি ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। আরও কিছু পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যেমন, 'বিজলী', 'বাতায়ন', 'যুগান্তর' ইত্যাদি। 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঋষি অরবিন্দের ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। এই পত্রিকার এক বছরের পুজোসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এছাড়া বিজলীর পুজোসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ কবিতাও লিখেছেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের শারদীয়া যুগান্তর পত্রিকায় লিখেছিলেন 'কালান্তর' নামে একটি কবিতা।

'দেশ' পত্রিকা তাদের প্রথম পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে ১৩৪১ সনে। এটি অবশ্য সাধারণ সংখ্যার বর্ধিত রূপ ছিল। ১৩৫৬ সনে দেশ পত্রিকার পুজোসংখ্যায় প্রথম উপন্যাস ছাপা হয়। সুবোধ ঘোষের 'ত্রিযামা'। ১৩৭২ সন অবধি দেশ পত্রিকার পুজো সংখ্যায় একটি করে উপন্যাস ছাপা হত। ১৩৭৩ সনে সম্পাদক সাগরময় ঘোষ পরিকল্পনা করেন তিনটি উপন্যাস ছাপার। এই তিনটি উপন্যাস ছিল বর্ষীয়ান সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, মধ্যবয়সী সাহিত্যিক সমরেশ বসু এবং অল্পবয়সী সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের প্রথম উপন্যাস ছাপতে থাকে এবং ক্রমে তা সংখ্যায় বাড়তে থাকে।) পরবর্তীকালে একবছর, সম্ভবত ১৩৭৮ সনে, দেশ শারদীয়ায় কবি ও ভিন্ন ধরনের লেখার লেখকদের দিয়ে উপন্যাস লেখানো হয়েছিল। সেবারে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন উপন্যাস 'অবনী বাড়ি আছো?' কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়-এর উপন্যাসের নাম ছিল 'সহবাস' আর প্রখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন 'সব চরিত্র কাল্পনিক' নামে উপন্যাস।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা কাহিনি শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রথমবার প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ সনে। নাম—'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'। পরের বছর দেশ শারদীয়ায় প্রকাশিত হল সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' এই উপন্যাসেই আমরা প্রথমবার পেলাম লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুকে। এরপর সত্যজিৎ রায় যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রতি বছরই আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল ফেলুদা-তোপসে-জটায়ু-র অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এবং দু-এক বছর বাদে প্রতি বছরই আমরা তাদের পেয়েছি 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। প্রসঙ্গত দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত আরও কয়েকটি বিখ্যাত লেখা এবং লেখকদের কথা বলি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পায়রা' আত্মপ্রকাশ করে শারদীয়া দেশ-এর পাতাতেই। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'ঘুন পোকা' প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া আনন্দবাজারের পাতাতে। যখন একটি করে উপন্যাস ছাপার রীতি ছিল শারদীয়া আনন্দবাজারে, তখন এক বছর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সারারাত' উপন্যাসের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ো গল্প 'মহাশ্বেতা'। 'মহাশ্বেতা' আসলে উপন্যাসই ছিল, কিন্তু যেহেতু তখনকার রীতি ছিল একটিমাত্র উপন্যাস ছাপার, তাই ওটিকে বড়ো গল্প নাম দিয়ে ছাপা হয়েছিল। পরে এই উপন্যাস থেকে 'হার মানা হার' নামে চলচ্চিত্র হয়েছিল, যাতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এবং বড়ো গল্প 'সখী ঠাকরুন'-ও প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাতেই। এক বছর শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বিবর'। কোনও শারদীয়া সংখ্যায় বোধহয় এমন তুফান তোলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি, আগে তো নয়ই, পরেও নয়। পরবর্তী সাধারণ সংখ্যা দেশগুলিতে 'বিবর'-এর পক্ষে-বিপক্ষে প্রায় শতখানেক চিঠি ছাপা হয়েছিল। প্রথম চিঠিটি ছিল বিবর-এর পক্ষে, লেখক ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। শংকর-এর জন অরণ্য, সীমাবদ্ধ, রমাপদ চৌধুরীর খারিজ, দ্বীপ বিমল করের দিনান্ত প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসগুলি আনন্দবাজার হাউসের পুজোবার্ষিকীগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই সময় 'যুগান্তর' ছিল আনন্দবাজারের প্রধান প্রতিযোগী। যুগান্তর গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল 'অমৃত'। প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, মনীন্দ্র রায় প্রমুখ লেখকরা লিখতেন এই দুটি কাগজে।

আগেই বলেছি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, গল্প ভারতী প্রভৃতি অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকাগুলির শারদীয়া সংখ্যাগুলিও খুবই আকর্ষণীয় হত। ১৩৬৭ সালে দেব সাহিত্যকুটির থেকে মাসিক পত্রিকা নবকল্লোল-এর আত্মপ্রকাশ। ওই বছরই শারদীয়া নবকল্লোল-এর প্রথম প্রকাশ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের রচনায় সাজানো ছিল সে সংখ্যাটি। সাধারণ নিউজ প্রিন্টে শারদীয়া ছেপে, দাম আয়ত্তের মধ্যে রেখে যে ভালো শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। তা দেব

সাহিত্য কুটির নবকল্লোল শারদীয়ার মাধ্যমে করে দেখিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্জরী অপেরা, গন্না বেগম প্রভৃতি উপন্যাসগুলি শারদীয়া নবকল্লোলেই আত্মপ্রকাশ করে।

যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি অধুনালুপ্ত দৈনিকগুলি যেমন তাদের পুজোসংখ্যা প্রকাশ করত, তেমনি এখন বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি দৈনিকগুলিও তাদের পুজোসংখ্যা বের করে। বর্তমান পত্রিকাটির পুজোসংখ্যার উপন্যাসগুলির মধ্যে চমৎকার বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সেখানে যেমন সামাজিক উপন্যাস, রহস্য উপন্যাস থাকে, তেমনি থাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস, জীবনীমূলক উপন্যাস ইত্যাদি। আনন্দবাজার গোষ্ঠী বিগত কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে 'পত্রিকা' নামে কম দামের একটি শারদ সংকলন প্রকাশ করে। এই পত্রিকাটিতে কয়েকটি উপন্যাসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ফিচার থাকে। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বাংলা কাগজ 'এই সময়' সাম্প্রতিককালের প্রকাশনা। এদের পুজো সংখ্যাটিও উল্লেখ করার মতন।

সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে একসময় জলসা, সিনেমা জগৎ, উল্টোরথ ইত্যাদি পত্রিকাগুলি এই সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধ এবং সাহিত্য নিয়ে বিপুল কলেবরে পুজোসংখ্যা প্রকাশ করত। তবে এ ধরনের পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সম্পাদনায়, নাম ছিল 'নাচঘর'। 'নাচঘর' পত্রিকার যে শারদীয়া সংখ্যা বেরোত, তা লেখায়-রেখায় অত্যন্ত মনোহর হত। যে সমস্ত লেখক/লেখিকারা লিখতেন, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যন্ত উল্লেখ করা হত। ১৩৩৪ সনের 'চিত্রে চিত্রে সুবিচিত্র শারদীয়া সংখ্যার নাচঘর' সম্পর্কে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"রঙিন-চিকন, পুরু কাগজে, গানে, গল্পে, নাট্যে, নক্সায়, রস রচনায় ও প্রবন্ধ সম্পদে, পূজার বাজারে অতুলনীয় হবে। আকারে বিপুল। দামে মোটে দু-আনা। কয়েকজন লেখকের নাম—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডা. শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি.আই.ই., রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম.এ.; শ্রীযুক্ত মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি.এল.; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত এস. ওয়াজেদ আলি, বি.এ. (ক্যাণ্টাব) বার. এট-ল; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম.এ.; সীতা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরী, বি.এ.; শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত, শ্রীযুক্ত ভারতকুমার বসু, শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ।" ফিরে আসি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত অন্যান্য পত্রিকাগুলির কথায়। খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা এইসব পুজোসংখ্যায় লিখতেন। নিমাই ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল রায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকাদের অনেক বিখ্যাত উপন্যাস এইসব পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় উল্টোরথ পুজো সংখ্যাতেই।

তেরোশো বঙ্গাব্দের ষাটের দশক থেকে সিনেমা পত্রিকাগুলির রমরমা শুরু। উল্টোরথ পুজোসংখ্যা কেনার জন্য একসময় কলেজস্ট্রিট চত্বরে লাইন লেগে যেত। পরবর্তীকালে

একই ধারার পত্রিকা 'প্রসাদ'-ও উল্লেখ করার মতন পুজোসংখ্যা প্রকাশ করতে থাকে। তেরোশো বঙ্গাব্দের সত্তর দশকের শেষ ভাগে 'প্রসাদ' পত্রিকার এক বছরের পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা'। নকশাল আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলিতে, শোনা যায়, জেলবন্দি নকশালদের হাতেও নাকি ওই উপন্যাস পৌঁছে গিয়েছিল। এই (চলচ্চিত্র) ধারার সর্বশেষ সংযোজন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 'আনন্দলোক' পত্রিকা, যার প্রথম পুজোসংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৮১ বঙ্গাব্দে। প্রথম বছরের পুজোসংখ্যা থেকেই এই পত্রিকায় খ্যাতনামা লেখকদের উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র, সংগীত সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখার সমাবেশ দেখা যায়। প্রথম পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ৫টি উপন্যাস, যার মধ্যে একটি ছিল নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্যভেদী কিরীটি-র কাহিনি। আরেকটি উপন্যাসের লেখক ছিলেন কালকূট (সমরেশ বসু)। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে সিনেমা জগৎ, জলসা আর উল্টোরথ বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে প্রসাদ এবং আনন্দলোক এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

একসময় আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ 'বেতার জগৎ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এতে আকাশবাণী কলকাতার এক পক্ষের অনুষ্ঠানসূচির পাশাপাশি কিছু সাহিত্যও থাকত। এই পত্রিকাটিরও আকর্ষণীয় পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হত ভালো সাহিত্যের পসরা নিয়ে। পুজো সংখ্যাটিতে মহালয়ার দিনের অনুষ্ঠানসূচির পাতায় ইনসেটে আকাশবাণীর সবচেয়ে বিখ্যাত অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র সময়সূচি এবং শিল্পী তালিকা বিজ্ঞাপিত হত। দূরদর্শন পুরোদমে চালু হবার পর বেতারের সুদিন চলে যায়, এই পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়।

ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা (অধুনালুপ্ত) যখন চালু ছিল, তখন প্রতি বছর তাদের পুজোসংখ্যা প্রকাশ করত। গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ দ্য স্টেটসম্যান কাগজটি 'ফেস্টিভ্যাল টাইমস্' নাম দিয়ে মননশীল প্রবন্ধ এবং ছোটোগল্পের সম্ভার নিয়ে পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে। হিন্দুস্থান টাইমস্ কাগজটি পুজোর সময় 'উৎসব' নামে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

ধর্মীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পত্রিকা 'উদ্বোধন'। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। প্রথম বছর থেকেই এই পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—বেদান্ত সাহিত্যের সোনার খনি এই পত্রিকা। পাঠক সমাজেও পত্রিকাটির বিপুল চাহিদা। দেশীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা যা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ঠাকুর-মা স্বামীজীর আশীর্বাদধন্য শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পত্রিকা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকে সঙ্গী করে। উদ্বোধন ছাড়াও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন (ব্যারাকপুর) থেকে প্রকাশিত 'তত্ত্বমসি', শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কাঁচের মন্দির) থেকে প্রকাশিত 'ভাবমুখে', লোকমাতা রানী রাসমনি ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'মাতৃশক্তি',

আদ্যাপীঠ মন্দির থেকে প্রকাশিত 'মাতৃপূজা' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিরও পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মূলত প্রবন্ধ নির্ভর এই পত্রিকাগুলির সম্পদ মননশীল রচনার আকর্ষণীয় সম্ভার। 'মাতৃশক্তি' পুজো সংখ্যাটি অবশ্য ধর্মীয় প্রবন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ এবং গল্প, কবিতা, উপন্যাসেরও বৃহৎ সমাবেশ থাকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত পুজো সংখ্যার মূল বিষয়বস্তু হতে ধর্ম ও সাহিত্য। এ কারণে ওই সময়কার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদকীয় ছাড়াও দুর্গা বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, রম্যরচনা, কার্টুন ইত্যাদি অনেক বেশি দেখা যেত। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। দেবী বন্দনায় থাকত পুরাণ, স্তোত্র, মুকুন্দরাম বা দাশরথি রায়ের রচনাংশ। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের দৈনিক বসুমতী পুজো সংখ্যায় 'ভক্তিসন্দর্ভ' নামে আলাদা একটি বিভাগ ছিল, সেখানে ছিল নটি ভক্তিরস সমৃদ্ধ কবিতা। তবে সাহিত্যপত্রগুলির পুজো সংখ্যায় ধর্মীয় বিষয়ে লেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কমতে থাকে।

লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নির্মাল্য আচার্য এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকা। এদের পুজো সংখ্যায় প্রধান আকর্ষণ ছিল সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য। প্রতিবছর পুজো সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের যে কোনও একটি সিনেমার পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য এরা প্রকাশ করতেন। নির্মাল্য আচার্যের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে আসানসোল থেকে প্রকাশিত 'কোলফিল্ড টাইমস্' এবং আন্দামান থেকে প্রকাশিত 'দ্বীপবাণী' পত্রিকা দুটি উল্লেখ করার মতো শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে।

খেলা, বিজ্ঞান, ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আগেও প্রকাশিত হত এখনও হয় এবং এসব পত্র-পত্রিকা তাদের বিষয়বস্তু দিয়েই তাদের পুজো সংখ্যা সাজায়।

এবার ছোটোদের পুজোসংখ্যায় কথায় আসা যাক। ছোটোদের প্রথম পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে, নাম ছিল 'পার্বনী'। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও উৎসাহে ওই পত্রিকা প্রকাশ করেন তাঁরই কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ওই পুজো সংখ্যা সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সকল দেশেই পূজা-পার্বণ প্রভৃতি আনন্দোৎসব ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক আয়োজন করা হয়, তাদের মন ভোলাবার জন্য কত খেলনা, কত বাঁশি আর কতরকম খাবার জিনিস তৈরি হয়...। এসব আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা পড়ে খুশি হবে, অনেক বিষয় জানতে পারবে, এজন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় নানা ধরনের বই ছাপানো হবে। সে দেশে বড়দিনের সময় বইয়ের দোকানে ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে, আর টেবিলের উপর সাজানো রং-বেরং-এর বই বেছে নেয়।...বিদেশে ছেলেমেয়েদের জন্য এত আয়োজন দেখে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম, বাংলাদেশের নামজাদা লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে লেখা ও ছবি সংগ্রহ করে প্রতি বছর শারদীয়া পূজার সময় তোমাদের জন্য একখানি বই বের করব।"

বিদেশে শিক্ষালাভের পাশাপাশি ছোটোদের জন্য যে বার্ষিকী প্রকাশের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, দেশে ফিরে তা অচিরেই বাস্তবায়িত হয়। একথা অনস্বীকার্য রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে নগেন্দ্রনাথের পক্ষে একাজ করা সম্ভব হত না। 'পার্বণী সম্পাদকের বৈঠক'-এ নগেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "অনেকদিন থেকে বন্ধুবান্ধব মহলে এই নিয়ে কথাবার্তা চলেছে, নানা পরামর্শ করা হয়েছে, কিন্তু কোনও কাজ হতে পারেনি। তারপর, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছ থেকে এই কাজে সায় পেয়ে লেখা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম।" পার্বণীর নামকরণ করেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আর পার্বণীতে কারা লিখেছিলেন? ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের মধ্যে লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একাধিক রচনা। ঠাকুরবাড়ির বাইরে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা হলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, শান্তা দেবী, সীতাদেবী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। এছাড়াও কতকগুলি পাতাজোড়া ছবি ছিল, যাদের শিল্পীরা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ।

পার্বণী প্রকাশমাত্রই পাঠসমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল। বিক্রয়মূল্য ছিল দেড় টাকা। এক হাজার বই দুমাসের মধ্যে সব বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। শুধু ছোটোদের নয়, বড়োদের কাছেও ওই পত্রিকা প্রভূত সমাদর পেয়েছিল। প্রত্যাশা পূরণের আনন্দে রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—"আমি ইহার বৈচিত্র্য, সৌষ্ঠব ও সরসতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি—অথচ ইহার মধ্যে পাঠকদের জানিবার, ভাবিবার, বুঝিবার কথাও অনেক আছে। তোমার এই সংগ্রহটি কেবলমাত্র ছুটির সময় পড়িয়া তাহার পরে পাতা ছিঁড়িয়া, ছবি কাটিয়া, কালি ও ধূলার ছাপ মারিয়া জঞ্জালের সামিল করিবার সামগ্রী নহে—আমাদের শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারে নিত্য ব্যবহারের জন্যই রাখা হইবে।"

এতদ্‌সত্ত্বেও পরের বছর অর্থাৎ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'পার্বণী' প্রকাশিত হতে পারেনি কারণ পুজোর আগে নগেন্দ্রনাথ প্রবাসে ছিলেন। ফলে, যথাসময়ে প্রস্তুতি নেওয়া যায়নি। ১৩২৭-এ আবার 'পার্বণী' প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যাতে আগেরবার পার্বণী প্রকাশ করতে না পারার মর্মবেদনা ঝরে পড়েছিল নগেন্দ্রনাথের লেখায়—"পূজার ছুটি এলো, তোমরা পার্বণী পেলে না। বাংলাদেশের চারদিক থেকে পার্বণীর জন্য অনেক তাগিদ আসতে লাগলো, আর তোমাদের পার্বণী পাঠাতে না পেরে আমার ক্ষোভের সীমা রইলো না।" ১৩২৭-এর পার্বণীতে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প এবং একটি কবিতা ছিল। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের পাশাপাশি লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, সীতা দেবী প্রমুখ। আর লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আর এক জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর দুই পুত্র মোহনলাল ও শোভনলাল, যাদের বয়স তখন যথাক্রমে এগারো ও দশ বছর, এই সংখ্যার আরও আকর্ষণ ছিল অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসুর কিশোরী কন্যা গৌরবালার আঁকা

ছবি। আশ্চর্যের বিষয় হল, এরপর আর কোনোদিনই পার্বণী প্রকাশিত হয়নি।

১৩২৬ সালে অন্য দুটি ছোটোদের বার্ষিকী প্রকাশিত হয়। একটির নাম ছিল 'আগমনী' যার সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। অন্যটির নাম ছিল 'রংমশাল'। তবে পত্রিকা দুটি জনপ্রিয়তা না পাওয়ায় পরবর্তীকালে আর প্রকাশিত হয়নি। আশুতোষ লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হত ছোটোদের মাসিক পত্রিকা 'শিশুসাথী'। চারবছর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রথমবার প্রকাশিত হয় 'শিশুসাথী' পত্রিকার পুজো সংখ্যা 'বার্ষিক শিশুসাথী'। প্রথম বছরে সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, এরপর বিভিন্ন বছরে সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন জগদানন্দ রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্তের মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকরাও বিভিন্ন বছরে এই বার্ষিকীর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। বার্ষিক শিশুসাথী বিপুল সমাদর পেয়েছে। প্রথম বছরের বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের 'আশিষ' নামে একটি ছোট্ট কবিতা। ছিল অবনীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ রচিত গল্প। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল সুনির্মল বসু, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ সাহিত্যিকদের। প্রথম বছরের বার্ষিক শিশুসাথী-র জন্য অগ্রিম নেওয়া হয়েছিল এবং ভালোরকম সাড়া পাওয়া গেছিল। সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'-য় লেখা হয় ''অগ্রিম মূল্য জমা দিয়া বার্ষিক শিশুসাথী-র গ্রাহক হইবার জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বিলাতের মতো না হইলেও আমাদের দেশেও যে শিশুদের বার্ষিক সাহিত্য পড়িবার আগ্রহ নাই, একথা বলা চলে না।''

বার্ষিক শিশুসাথী প্রকাশের আগে ছোটো পাঠকদের জন্য একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এর ফলে কিছুটা আগাম প্রচারও হয়েছিল। শুধু পুরস্কৃত তিনটি রচনাই নয়, সমস্ত প্রতিযোগীদের নাম, হয়তো প্রচারের কথা ভেবেই, ছাপা হয়েছিল বার্ষিক শিশুসাথী-তে। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে খুদে পাঠকদের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন উঠেছিল। 'আমাদের কথা'-য় লেখা হয়েছিল—'আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, বাংলাদেশ থেকে আমরা এত অসংখ্য প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ ও কবিতা পাইব, শুধু বাংলা কেন, ভারতের প্রায় প্রত্যেক বিভাগ থেকেই প্রবাসী বাঙালি শিশুরা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠাইয়া আমাদিগকে অতিমাত্রায় বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে।''

দ্বিতীয় ও চতুর্থ বছরে প্রতি বছর সম্পাদক পরিবর্তন হলেও লেখক সূচি মোটামুটি একইরকম ছিল। পঞ্চম বছরে লেখক সূচিতে তিনটি উল্লেখযোগ্য নাম সংযোজিত হল—স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রখ্যাত বিজ্ঞানভিত্তিক লেখক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এবং অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)। পরবর্তীকালে যেসব বিখ্যাত সাহিত্যিক বার্ষিক শিশুসাথীর উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন—সুখলতা রাও, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,

যতীন্দ্রমোহন বাগচি, প্রিয়ম্বদা দেবী, এস. ওয়াজেদ আলি, জসীমউদ্দীন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ। বার্ষিক শিশুসাথীতে গল্প-কবিতার পাশাপাশি পি.সি. সরকারের ইন্দ্রজাল, কাফী খাঁ এবং শৈল চক্রবর্তীর কার্টুনও প্রকাশিত হত। এই বার্ষিকীটি একটানা ৪৩ বছর প্রকাশিত হয়েছিল।

দেব সাহিত্য কুটির থেকে ছোটোদের পুজোবার্ষিকী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আরও কয়েকটি ছোটোদের পূজাবার্ষিকীর কথা বলে রাখি। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির সম্পাদনায় 'ছোটোদের বার্ষিকী' নামেই একটি ছোটোদের পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আরও বেশ কিছু খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিকের সম্পাদনায় কিছু ছোটোদের পূজা বার্ষিকী প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন, স্বপনবুড়োর সম্পাদনায় 'মধুচক্র' (১৩৪১), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সম্পাদনায় 'গল্পের মণিমালা' (১৩৫২), ইন্দিরা দেবীর সম্পাদনায় 'সাত সমুদ্দুর' ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, 'গল্প সঞ্চয়'। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা ভূমিকাটি ব্লক করে ছাপা হয়েছিল সেখানে। সেটি থেকে একটি অংশ, যা এখনও প্রাসঙ্গিক, এখানে তুলে দিচ্ছি—"ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা-মাসিরা তাদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে। ...আজকের দিনের মা, মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। ছেলেরা আজও বলছে, গল্প বলো।" দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত পত্রিকাগুলির কোনোটিই বেশিদিন চলেনি।

ফিরে আসি দেব সাহিত্য কুটির-এর কথায়। ১৩৩৮-এ প্রকাশিত দেব সাহিত্য কুটির-এর প্রথম বর্ষের পূজাবার্ষিকীটি ছিল শুধুই কবিতার, নাম ছিল ছোটোদের চয়নিকা। কেন শুধু কবিতা দিয়ে বার্ষিকী করা হল, এ সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয়, সুনির্মল বসু ও গিরিজাকুমার বসু, জানিয়েছেন—"ছোটোদের জন্যে বাংলা ভাষায় যেসব কবিতা লেখা হয়েছে তার একটি সংগ্রহ বের করবার আবশ্যকতা বোধ হওয়ার ফলে ছোটোদের চয়নিকার প্রকাশ।" এই বার্ষিকীটির কবি তালিকা বিস্ময় জাগায়, রচনা বৈচিত্র্য দেখলে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে ছোটোদের জন্য কত সুন্দর সুন্দর কবিতা একসময় লেখা হয়েছে। এই বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের ৪টি কবিতা ছিল, আর যাঁদের কবিতা এই সংকলন ছিল, তাঁরা হলেন—যতীন্দ্রমোহন বাগচি, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনী রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রিয়ম্বদা দেবী, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। অলঙ্করণ করেছিলেন প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো খ্যাতনামা শিল্পীরা। পরবর্তীকালে কিন্তু আর কোনোদিন শুধু কবিতা নিয়ে দেব সাহিত্য কুটির কোনও বার্ষিকী প্রকাশ করেনি। ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত দেব সাহিত্য কুটিরের পুজোবর্ষিকী 'ছোটোদের গল্প সঞ্চয়ন'-এর লেখক সূচিতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকবৃন্দ।

এরপর প্রতিবছর নতুন নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করত দেব সাহিত্য কুটিরের ছোটোদের পূজাবার্ষিকী, যেমন—রাঙারাখী, জয়যাত্রা, পরশমণি, ইন্দ্রধনু, অরুণাচল, শুকসারী, বেণুবীনা আরও কত। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক সম্পাদনা করেছে। যেমন—সুনির্মল বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৩৫২ সাল পর্যন্ত অবধি সাহিত্যে জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিরা সম্পাদনা করেছেন এই বার্ষিকীর। ১৩৫৩ থেকে সম্পাদক হিসাবে আর কারও নাম প্রকাশিত হত না। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, বার্ষিক শিশুসাথীতে মূলত শিশু সাহিত্যিকদের লেখাই প্রকাশত হত। দেব সাহিত্য কুটিরের বার্ষিকীতে তাঁদের পাশাপাশি মূলত যাঁরা বড়োদের লেখক, তাঁদের লেখা নিয়মিতভাবেই বেরিয়েছে। কারা ছিলেন লেখক তালিকায়? রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার মৈত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তৎকালীন প্রায় সমস্ত বিখ্যাত লেখক। এই বার্ষিকীটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে দেব সাহিত্য কুটিরের কর্তৃপক্ষ কতকগুলি নীতি মেনে চলেছিলেন। যেমন—ছোটোদের জন্য বইটি প্রকাশিত হচ্ছে, অতএব কোনও বিজ্ঞাপন থাকবে না। বইটির আয়তন খুব বড়ো হবে না। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা এখানে রাখা হবে। বইটির ছাপা হবে ঝকঝকে, প্রচ্ছদ হবে আকর্ষণীয়। তাঁদের আর একটি লক্ষ্য ছিল, বইটি যেন Collector's Piece হিসাবে বইয়ের আলমারিতে স্থান পায়, অর্থাৎ পুজোর পর পড়া হয়ে গেলে যেন অন্য কাগজের সঙ্গে সের দরে বিক্রি না হয়ে যায়।

এখন যাঁরা প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, তাঁরা জানেন কী অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে তাঁরা অপেক্ষা করতেন মহালয়ার আগে এই পূজাবার্ষিকীটি হাতে পাবার জন্য। পড়া হয়ে গেলে বইটি ঠাঁই পেতে গল্পের বইয়ের আলমারিতে। দেব সাহিত্য কুটির কর্তৃপক্ষ এখন আবার নতুন করে সেই পুরনো সংখ্যাগুলিকে প্রকাশ করছেন এবং সেগুলির চাহিদা দেখলে বোঝা যায়, সেগুলির আবেদন আজও একটুও কমেনি। আর প্রৌঢ়দের এই বইগুলি ভীষণভাবে নষ্ট্যালজিক করে তোলে।

এই বার্ষিকীগুলিতে গল্পগুলিকে বিষয়ভিত্তিক সাজানো হত। যেমন—গল্প, হাসির গল্প, ভূতের গল্প, রহস্য গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, পুরাণের গল্প ইত্যাদি। ছোটোরা অপেক্ষা করে থাকত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা', শিবরাম চক্রবর্তীর 'হর্ষবর্ধন', রাজকুমার মৈত্রের 'বগলামামা'-র জন্য। এই বার্ষিকীগুলির মাধ্যমে এই চরিত্রগুলির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে।[৪] এছাড়াও প্রতি বছর থাকত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ

---

৪. পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের কাবুল-টাবুল আর তাদের ফিজিক্যাল টেস্ট দিয়ে পাশ করা মাস্টারমশাই ধুরন্ধর সামন্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রদীপ নারায়ণ দত্ত (পি.এন.ডি.) অর্থাৎ পিণ্ডিদা, ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভাইপো, শক্তিপদ রাজগুরুর পটলা আর তার দলবল। এরাই তো সবাই মিলে আমাদের কিশোরবেলার পুজোকে নির্মল আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

ভট্টাচার্যের বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য কাহিনি, ড. বিশ্বনাথ রায়ের আবিষ্কারের কাহিনি, পি.সি. সরকারের ইন্দ্রজাল, বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'অমরেশ'-কে নিয়ে নাটক, নারায়ণ দেবনাথের কমিকস ইত্যাদি। দেব সাহিত্য কুটিরের বার্ষিকীগুলি মূলত ছোটোগল্প নিয়ে তৈরি হয়ে পরের দিকে কখনও নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্য উপন্যাস, আবার কখনও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিখ্যাত 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে' ছড়াটিও প্রকাশিত হয়েছিল 'রাঙারাখী' পূজাবার্ষিকীতে। এই বার্ষিকীটি প্রকাশিত হয় স্বাধীনতার বছরে, অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পুজোয়। সংখ্যাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেকগুলি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শুরু করে দেব সাহিত্য কুটিরের শেষ বার্ষিকীটি 'আরাধনা' নামে প্রকাশিত হয় ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। এরপর থেকে তাঁরা তাঁদের ছোটোদের মাসিক পত্রিকা 'শুকতারা'-র শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক মিলিয়ে এটি একটি আকর্ষণীয় পুজোসংখ্যা হিসাবেই প্রকাশিত হয়।

শরৎ সাহিত্য ভবন থেকে ১৩৫২ বঙ্গাব্দ থেকে দশ বছর প্রকাশিত হয়েছিল ছোটোদের বার্ষিকী প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন নামে। সম্পাদনা করতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। দেশের মাটি, ছায়াপথ, সুপ্রভাত, আকাশদীপ ইত্যাদি নামে প্রকাশিত বার্ষিকীগুলি শুধু ছোটোদের নয় বড়োদেরও মনোহরণ করেছিল। সুনির্মল বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, আশাপূর্ণা দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শিবরাম চক্রবর্তী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রায় প্রতি বছরই এই বার্ষিকীতে লিখতেন। লিখতেন সৌরীন্দ্রমোহন কন্যা সুচিত্রা, তখনও তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র হননি। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের লেখাও প্রকাশিত হয়েছে এই বার্ষিকীতে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'কাকপণ্ডিত' প্রকাশিত হয়েছিল এদের প্রথম বছরের বার্ষিকী 'কলরব'-এ।

বিগত বঙ্গাব্দে ৫ থেকে ৭ দশকে ছোটোদের অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হত, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রামধনু', সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক', এশিয়া পাবলিশিং হাউস থেকে 'রোশনাই' প্রভৃতি। এদের পুজোসংখ্যাগুলিও খুবই আকর্ষণীয় হত। দুঃখের বিষয়,'এই পত্রিকাগুলির কোনোটাই বর্তমানে প্রকাশিত হয় না।

ছোটোদের আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'সন্দেশ'। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমারের পর একসময় সত্যজিৎ রায় সম্পাদনা করেছেন। বস্তুত পুরোদস্তুর লেখক সত্যজিৎ রায়কে আমরা পাই 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্যেই। সত্যজিতের দুই বিখ্যাত চরিত্র গোয়েন্দা ফেলুদা এবং বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু-র আবির্ভাবও সন্দেশের পাতাতেই। 'সন্দেশ' পত্রিকা আমাদের উপহার দিয়েছে অসাধারণ সব পুজাবার্ষিকী যেখানে আমরা বিখ্যাত লেখকদের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রতিভাবান লেখককে পেলাম। সঙ্কর্ষণ রায়, শিশির কুমার মজুমদার, অজেয় রায়, মঞ্জিল সেন—প্রতি বছরই প্রায়পুজো সংখ্যা সন্দেশ পত্রিকায় তাঁদের লেখায় আমাদের মুগ্ধ করেছেন।

বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলাল ধরের সম্পাদনায় 'আনন্দ' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশিত হত বিগত বঙ্গাব্দের সাত-এর দশকে। চমৎকার বোর্ড বাঁধাই করা এই পুজোসংখ্যাগুলির প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা ৫টি করে উপন্যাস, অনেকগুলি ছোটো গল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদি এই বার্ষিকীটি অবশ্য অল্প কয়েক বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৭৫ সালে পুজোয় প্রকাশিত হয় শারদীয়া কিশোর ভারতী। প্রচুর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, কমিকস্-এর সম্ভারে ভরা ভারি চমৎকার এক পূজাবার্ষিকী। পত্রিকাটি এরপর থেকে মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তবে তাদের পুজাবার্ষিকীগুলি প্রতি বছর একইরকম আকর্ষণীয় হয়।

১৩৭৮-এ আনন্দবাজার প্রকাশনের ছোটোদের পুজোসংখ্যা 'আনন্দমেলা'-র প্রথম প্রকাশ। তখন দাম ছিল দু-টাকা। প্রথম বছরের পুজোসংখ্যায় ছিল দুটি উপন্যাস, যার একটি ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'ভয়ঙ্কর সুন্দর'—যেখানে আবির্ভাব ঘটে দুই বিখ্যাত চরিত্র সন্তু ও কাকাবাবুর। আনন্দমেলা পুজোসংখ্যায় বিভিন্ন বছরে আমরা যেমন সন্তু-কাকাবাবুর বিভিন্ন অভিযান পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি বিমল করের কিকিরা-তারাপদ-চন্দন ত্রয়ীকে, সমরেশ মজুমদারের অর্জুন-অমল সোমকে। আমরা পেয়েছি মতি নন্দীর খেলার জগৎকে নিয়ে লেখা অসাধারণ উপন্যাসগুলিকে ননীদা, স্ট্রাইকার, স্টপার, কোনি-দের। আমরা বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে চরিত্রদের মজার মজার কাণ্ডকারখানা-গোঁসাইবাগানের ভূত, হেতমগড়ের গুপ্তধন, নৃসিংহ রহস্য, ভূতুড়ে ঘড়ি এবং আরও কত উপন্যাসে। আমরা উপভোগ করেছি আশাপূর্ণা দেবীর ট্যাপা, মদনের কাণ্ডকারখানা।[৫] আরও সব অসাধারণ উপ্যাস, গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের 'গোগো দি গ্রেট', সুবোধ ঘোষের 'সেই অদ্ভুত অভ্রখনিটা', শেখর বসুর 'সোনার বিস্কুট' ইত্যাদি। সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুর কাহিনি তো প্রতি আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল। আনন্দমেলা পুজো সংখ্যা এখনও প্রতি বছর আকর্ষণীয় পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে। কালের নিয়মে প্রফেসর শঙ্কু, সন্তু-কাকাবাবু, কিকিরা বিদায় নিয়েছেন। নতুন আকর্ষণ হিসাবে সেখানে সংযোজন হয়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের টুপুর-মিতিনমাসি, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের ঝিনুক-দীপকাকুদের অভিযান। আনন্দমেলার বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধগুলি একইরকম চিত্তাকর্ষক আছে।

একটি অন্যরকম পুজোসংখ্যার কথা বলি। একসময় গ্রামোফোন কোম্পানি যা এইচ.এম.ভি. নামে খ্যাত রেকর্ডে পুজোর গান প্রকাশ করতেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেরিয়েছে রেকর্ডে পুজোর গান। বাংলার বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে সারা

---

৫. হাসিতে আমাদের পেটে খিল ধরেছে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বড়োমামা-মেজোমামার কৌতুকময় কাহিনিগুলো পড়ে, আমরা রোমাঞ্চিত হয়েছি বুদ্ধদেব গুহ-র ঋজুদার অ্যাডভেঞ্চারে সঙ্গী হয়ে। এছাড়াও পেয়েছি

ভারতের বিখ্যাত শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ানো পুজো উপলক্ষ্যে নতুন গান রেকর্ডে প্রকাশিত হত। সেইসব শিল্পীদের ছবি এবং তাঁদের নতুন গানের লিরিক নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি একটি বই প্রকাশ করত। যার নাম ছিল 'শারদ অর্ঘ্য'। যে কোনও নামী পুজোসংখ্যার মতোই চাহিদা ছিল এই বইটির। যাঁরা পুজোর রেকর্ড কিনতেন, তাঁরা তো গানের কথার জন্য এ বই কিনতেনই, যাঁরা রেকর্ড কিনতেন না, তাঁরাও রেডিওতে পুজোর গান শোনার জন্য এ বইটি কিনতেন। রেকর্ড যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বইটিরও প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে।

এককালে শারদীয়া সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কার্টুন। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম অবশ্যই করতে হয়, তাঁরা হলেন অহিভূষণ মালিক, চণ্ডী লাহিড়ী, রেবতীভূষণ ঘোষ, কুট্টি, দেবাশীষ দেব প্রমুখ। এখন তো আর শারদীয়া সংখ্যায় কার্টুনের সন্ধানই মেলে না। তবে ছোটোদের পত্রকাগুলিতে এখন কমিকস্ বেশ ভালো সংখ্যাতেই উপস্থিত থাকে। এ ব্যাপারে নারায়ণ দেবনাথের হাঁদা-ভোদা, বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টেদা-র নাম সর্বাগ্রে আসবে। এছাড়া ময়ূখ চৌধুরী বা তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের অ্যাডভেঞ্চার কমিকস্ একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। এখন পূজাসংখ্যা আনন্দমেলাতে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখের হাসির গল্প কমিক্স আকারে প্রকাশ করা হয়। পুজোসংখ্যার গল্প-উপন্যাসগুলির সঙ্গের ইলাস্ট্রেশনগুলির কথা না বললে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেব সাহিত্য কুটির-এর পত্রিকাগুলির ইলাস্ট্রেশন করতেন মূলত প্রতুল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ দেবনাথ, তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী প্রমুখ। কিশোরভারতী পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন করতেন মূলত সূর্য রায়। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলির ইলাস্ট্রেশন করেন সুধীর মৈত্র, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, মদন সরকার, সমীর সরকার, বিমল দাস প্রমুখ শিল্পী। বিমল দাসের ছবি আঁকা দেখে সত্যজিৎ রায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কী পেন দিয়ে আঁচড় কাটেন যাতে এত সমানভাবে আঁচড় পড়ে?' সত্যজিৎ রায় নিজের গল্পের ইলাস্ট্রেশন নিজেই করতেন। এছাড়া 'সন্দেশ' পুজোসংখ্যায় প্রচ্ছদ আঁকতেন এবং অন্যান্য লেখকদের বেশ কিছু লেখায়ও তিনি ইলাস্ট্রেশন করতেন। একবার অসুস্থতার কারণে ফেলুদা কাহিনি 'রবার্টসনের রুবি'-র ইলাস্ট্রেশন সত্যজিৎ রায় করে উঠতে পারেননি। সত্যজিৎ রায়ের ইচ্ছায় সে কাজ সম্পন্ন করেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। একবার আনন্দমেলা পুজোসংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে একটি গান 'আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে' ছাপা হয়েছিল (বলাবাহুল্য তখনও ওই ছবিটি মুক্তি পায়নি)। গানটির সঙ্গে যে ইলাস্ট্রেশনটি ছাপা হয়েছিল, তাও করেছিলেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য, এই ছবিতে সুব্রতবাবুর পোশাকগুলি যেমন এঁকেছিলেন, সত্যজিৎ রায় সিনেমাতেও তেমনই রেখেছিলেন।

যেসব শিল্পীর কথা বলা হল, তাঁরা প্রত্যেকেই খ্যাতনামা শিল্পী, প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব স্টাইলের জন্য পরিচিত, বিখ্যাত। এঁরা ছাড়াও আরও অনেক শক্তিশালী শিল্পী আছেন,

যাঁদের কাজ অবশ্যই উল্লেখ করার মতো, যেমন কৃষ্ণেন্দু চাকী, সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

পুজো সংখ্যা প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা হল, আবার হয়তো কিছু কথা বাদ থেকেও গেল। পুজোসংখ্যা প্রকাশের শুরুর সময় থেকে এখন অবধি এমন কোনও বিখ্যাত সাহিত্যিক নেই যিনি পুজোসংখ্যায় লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, বিমল মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বনফুল, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায়, শংকর, শিবরাম চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বাণী বসু আরও কত স্বনামধন্য লেখক পুজো সংখ্যার পাতা অলঙ্কৃত করেছেন এবং করছেন। যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম, তাঁরা মূলত গল্প-উপন্যাসের লেখক। এছাড়া অনেক বিখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক তাঁদের রচনা দিয়ে অনেক পুজোসংখ্যাকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আসলে পুজোসংখ্যা বলতে তো আমরা মূলত সাহিত্যের পুজোসংখ্যার কথাই বুঝি, তাই আলোচনাটাও মূলত গল্প-উপন্যাস কেন্দ্রিকই হয়। একটা সময় ছিল যখন পুজোর ছুটির পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ক্যান্টিনে বা ক্লাসরুমে পুজোসংখ্যার গল্প-উপন্যাস নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তুমুল আলোচনা হত। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, পুজোসংখ্যা নিয়ে সেই উন্মাদনা এখন আর নেই। তার কারণ, অনেক পাঠকের মতে অধিকাংশ পুজোসংখ্যার মান এখন আর আগের মতো নেই। তবে মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে পুজোসংখ্যার আকর্ষণ এখনও অটুট আছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়। প্রায় প্রত্যেক পত্র-পত্রিকাই পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, পুজো সংখ্যার একটা আলাদা চাহিদা আছে।

বাঙালির যেমন আছে বেড়ানোর নেশা, তেমনি আছে বই পড়ার নেশার কারণে পুজো সংখ্যার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। আগে বাঙালিবাবুরা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যেতেন পশ্চিমে, সঙ্গে অবশ্যই থাকত পুজোসংখ্যা। এখন বাঙালিবাবুরা যান ট্যুরে, সেখানেও সঙ্গী হয় পুজোসংখ্যা। অর বাড়িতে থাকতে তো পুজেসংখ্যাই পুজোর কদিনের সেরা সঙ্গী।

একসময় পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসু এবার পুজোয় কী লিখবেন, এই কৌতূহল পাঠকদের মধ্যে প্রবলভাবে থাকত। পরবর্তীকালে কালকূটের লেখা এবং শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে পাঠকসমাজের বিপুল কৌতূহল লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য গোয়ন্দা কাহিনির প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বরাবরই প্রবল। যে কারণে আমরা শারদীয়া বর্তমান পত্রিকায় একসময় প্রতি বছর পেয়েছি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গোয়েন্দা চারু ভাদুড়ির কাহিনি, শারদীয়া নবকল্লোর-র পাতায় সৈয়দ মুস্তাফা

সিরাজের কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের রহস্য সমাধানের কাহিনি। একসময় নবকল্লোল দপ্তরে পাঠকরা ফোন করে জানতে চাইতেন, এবার পুজোয় আশাপূর্ণা দেবী লিখছেন কি না। এতটাই আগ্রহ ছিল পাঠকমহলে তাঁর লেখাকে ঘিরে। এখন খুব কম লেখকের লেখাকে ঘিরে এরকম কৌতূহল দেখা যায়, যেমন শারদীয়া বর্তমান পত্রিকায় বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখছেন 'পিরিয়ড পিস', এক একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ধরে। পাঠকসমাজের মধ্যে এই আগ্রহ দেখা যায়, এবার তিনি কাকে নিয়ে কোন্ পিরিয়ডের কথা লিখবেন?

একথা অনস্বীকার্য যে পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত অনেক রচনাই পরবর্তীকালে সাহিত্যের ইতিহাসে চিরন্তন স্থান করে নিয়েছে। শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে তাগিদেই নয়, সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদেও সেসব সাহিত্য রচনা করেছেন লেখকরা। আগে পুজোসংখ্যায় একটি করে উপন্যাস প্রকাশিত হত, ফলে পাঠক সমাজে কৌতূহল থাকত এই নিয়ে—কে এবার পুজোসংখ্যার জন্য উপন্যাস লিখছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ চারের দশকের পুজোসংখ্যা থেকে উপন্যাস ছাপা শুরু করলেও অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে উপন্যাস ছাপা শুরু হয় আরও পরে। সেই একটি উপন্যাসের যুগে অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় একবছর প্রকাশিত হয়েছিল সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'গৃহ ও গ্রহ'। অজিত দত্ত সম্পাদিত 'দিগন্ত' পত্রিকার এক বছরের পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত হল সন্তোষকুমার ঘোষের বিখ্যাত উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি'। নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস 'আকাশগঙ্গা' প্রকাশ পেয়েছিল শারদীয়া 'বসুমতী'-তে। সেই সময় পুজোসংখ্যাগুলিতে ছিল প্রবন্ধের প্রাধান্য। কবিতাও প্রচুর সংখ্যায় ছাপা হত। ছোটোগল্প ছাপা হত ২০ থেকে ২৫টা, কবিতা প্রকাশিত হত ৫০ থেকে ৬০টা। কিন্তু এখন ছবিটা পুরো পাল্টে গেছে। এখন ছোটোগল্পের সংখ্যা ৮ থেকে ১০-এ নেমে এসেছে, কবিতাও ২০-২২টির বেশি নয়। গবেষণাধর্মী সিরিয়াস প্রবন্ধ খুব কমই ছাপা হয়, সে জায়গা দখল করেছে ফিচারধর্মী হালকা লেখা। এখন প্রায় প্রতিটি পুজোসংখ্যাতে একাধিক উপন্যাস থাকে, কোনও কোনও পুজোসংখ্যায় ৬ থেকে ৮টা পর্যন্ত উপন্যাস থাকে। তাছাড়া, প্রায় সমস্ত লেখকই কোনও না কোনও পুজোসংখ্যায়, কেউ কেউ আবার একাধিক পুজোসংখ্যায় উপন্যাস লেখেন। ফলে কে উপন্যাস লিখেছেন সে কৌতুহলটাই আর নেই। একটা সময় পুজোসংখ্যা আনন্দবাজারের জন্য লেখা চেয়ে বিজ্ঞাপন বেরোত, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সেরকম একটি বিজ্ঞাপন এখানে তুলে দিচ্ছি—"যাঁহারা এই সংখ্যায় (পূজা) লিখিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক নিম্ন ঠিকানায় তাঁহাদের রচনা পাঠাইবেন।" এখন এ কথা ভাবা যায়?

বাঙালিদের কাছে পুজোসংখ্যার গুরুত্ব কতখানি, যাঁরা বাঙালি নন তাঁদের এটা বলে বোঝানো প্রায় অসম্ভব। আর কোনও ভাষায় বা রাজ্যে কোনও উৎসবকে কেন্দ্র করে এরকম সাহিত্য প্রকাশের রীতি আছে বলে জানা নেই। সুতরাং পুজোসংখ্যা বিষয়টা একান্তভাবেই বাঙালির নিজস্ব সম্বল হিসেবে ধরা যায়।

শারদীয়া পুজোর আনন্দ ঝলমল দিনগুলোতে বাঙালি পাঠকের যেমন সাহিত্যপ্রাপ্তি হয় পুজোসংখ্যায়, তেমনি লেখক, প্রকাশকরাও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হন। যাঁরা সারা বছর কোনও পত্র-পত্রিকা কেনেন না, তাঁরাও অনেকে অন্তত একটা পুজোসংখ্যা কেনেন।

সারা বছরের যান্ত্রিক জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে পুজোর ছুটির কয়েকটা দিন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাওয়ার জন্য বাঙালি উৎসুক হয়। পাঠকের সেই ঔৎসুক্য মেটাবার প্রধান উপায় হয়ে আসে সাহিত্যের শারদ-সম্ভার। তাই বাঙালি জীবনে পুজোর শারদীয়া সংখ্যা অপরিহার্য অঙ্গ। সেকালেও ছিল, একালেও আছে।